রোহিঙ্গাদের গণহত্যা: আরেকটি বসনিয়া কি তৈরি করা হচ্ছে?
বিচারের দাবি সোচ্চার হলেও জাতিসংঘের কোনও উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ নেই

মূল রচনা: **শাখওয়াত লিটন**
প্রকাশ: **ডেইলি স্টার, ২৫ ডিসেম্বর, ২০১৭**
ভাবানুবাদ: **মো. মজিবুল হক মনির, কোস্ট ট্রাস্ট**

নয় বছর আগে রুয়ান্ডা এবং সাবেক যুগোস্লাভিয়া বিষয়ক আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের সাবেক এক বিচারক ও দুই আইনজীবী মিয়ানমারের মানবাধিকার লঙ্ঘন সংক্রান্ত দলিলাদি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখার সময়, বহু বছর ধরে সেখানে চলে আসা তীব্র, ব্যাপক এবং পদ্ধতিগত মানবাধিকার লংঘনের পরেও জাতিসংঘের মতো একটি বৈশ্বিক সংস্থার নিস্ক্রিয়তায় খুব অবাক হয়েছিলেন।

তারা দেখলেন যে জাতিসংঘের বিভিন্ন রেজুলেশনগুলোতে (সনদ) এবং স্পেশাল রেপোটিয়ারদের নানা প্রতিবেদনে মানবাধিকার লংঘনের বিষয়ে বার বার উল্লেখ করা হয়েছে। এরপরেও জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ এই বিষয়ে কোনও পদক্ষেপ নেয়নি, যদিও এই বিষয়ে সাবেক যুগোস্লাভিয়া এবং পশ্চিম সুদানের দারফুরোর মতো একই ধরনের উদ্যোগ নেওয়াই উচিৎ ছিল।

আন্তর্জাতিকভাবে প্রশংসিত আইনজ্ঞ যুক্তরাষ্ট্রের বিচারপতি প্যাট্রিকিয়া এম ওয়াল্ড, দক্ষিণ আফ্রিকার জাস্টিস রিচার্ড জোনস্টোনস্টন এবং যুক্তরাজ্যের স্যার জ্যফ্রি নাইস কুইচ ২০০৯ সালে "বার্মার অপরাধ" (ক্রাইমস ইন বার্মা) নামের একটি প্রতিবেদন তৈরি করেছিলেন, হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ল স্কুলের উদ্যোগে এই প্রতিবেদনটি তৈরি করা হয়। কলম্বিয়া ডিস্ট্রিকের জন্য মার্কিন আদালতের আপিল বিভাগের সাবেক প্রধান বিচারপতি বিচারপতি ওয়াল্ড সাবেক যুগোস্লাভিয়ার জন্য গঠিত আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-এর একজন বিচারক ছিলেন। দক্ষিণ আফ্রিকার সাংবিধানিক আদালতের বিচারক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন বিচারপতি গোল্ডস্টোন, সাবেক যুগোস্লাভিয়া এবং রুয়ান্ডার জন্য গঠিত আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে তিনি ছিলেন প্রধান প্রসিকিউটর। স্যার নাইস ছিলেন সাবেক যুগোস্লাভিয়া এবং রুয়ান্ডার জন্য গঠিত আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে ডেপুটি প্রসিকিউটর এবং হেগ আন্তর্জাতিক আদালতে স্লোবোদান মিলেসেভিক এর বিরুদ্ধে মামলায় তিনি ছিলেন প্রধান আইনজীবী। মিলোসেভিচই বিশ্বের প্রথম রাষ্ট্রপতি যিনি আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত কর্তৃক যুদ্ধাপরাধের জন্য দোষী সাব্যস্ত হন।

জাতিসংঘ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত দুটি আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে বিচারপতি ও প্রসিকিউটর হিসেবে, তারা রুয়ান্ডা এবং বসনিয়াতে গণহত্যার অপরাধীদের বিচার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার জন্য নিরবিচ্ছিন্নভাবে কাজ করে গেছেন। ভেনেজুয়েলার বিচারক পেড্রো নিক্কো, ইন্টারন্যাশনাল কমিশন ফর জুরিস্টস-এর কার্যনির্বাহী কমিটির সাবেক সদস্য এবং মঙ্গোলিয়ার সুপ্রিম কোর্টের সাবেক বিচারক গেনজরিগ গোমবোসনও তাদের সাথে কাজ করেছেন। তাদের পরীক্ষা নিরীক্ষায় দেখা যায় যে, ১৯৯২ সাল থেকে জাতিসংঘের বিভিন্ন দলিল দস্তাবেজে মায়ানমারের মানবাধিকার ও মানবিক আইন লঙ্ঘনের বিষয়টির নানা ভাবে উল্লেখ রয়েছে।

হার্ভার্ড ল স্কুলের ইন্টারন্যাশনাল হিউম্যান রাইটস ক্লিনিক মায়ানমারের চার ধরনের অপরাধ পর্যালোচনা করে প্রতিবেদনটি তৈরি করেছে, সেই চার অপরাধ হলো: জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুতি, যৌন সহিংসতা, হত্যা এবং নির্যাতন। এসব বিষয়ই ২০০২ সাল থেকে জাতিসংঘের বিভিন্ন প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রতিবেদনের ফলাফল এবং সুপারিশের ভিত্তিতে, পাঁচ বিচারক জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের কাছে মিয়ানমারের মানবতাবিরোধী অপরাধ ও যুদ্ধাপরাধের বিরুদ্ধে তদন্ত পরিচালনা ও প্রতিবেদন প্রদানের জন্য অবিলম্বে একটি তদন্ত কমিশন গঠনের আহ্বান জানিয়েছেন। তাঁরা তাঁদের প্রতিবেদনে

উল্লেখ করেন, মিয়ানমারের জনগণের বিরুদ্ধে সামরিক সরকারের গণহত্যা অব্যাহত থাকার সময় বিশ্ব চুপ করে বসে থাকতে পারে না। তাঁরা আরও উল্লেখ করেন যে, আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত কর্তৃক একটি বিশেষ ট্রাইব্যুনাল গঠনের দাবি উঠে আসা খুব স্বাভাবিক এবং এই ধরনের পদক্ষেপের প্রতি সমর্থন প্রকাশের জন্য জাতিসংঘের সদস্য দেশগুলোকে প্রস্তুত থাকা উচিত।

হার্ভার্ডের ল স্কুল এই বিষয়ে আরও একটি পদক্ষেপ নেয়, ২০১১ সালে মায়ানমারের বিষয়ে আরও একটি তদন্ত পরিচালনা করা হয়।

২০১৪ সালে তদন্তটির একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়, যেখানে বলা হয় যে ২০০৫–০৬ সালে মিয়ানমার সেনাবাহিনীর তিনজন কমান্ডার ও একটি কমব্যাট ডিভিশন দেশটির কাচিন ও উত্তর শান রাজ্যে যুদ্ধাপরাধ ও মানবতাবিরোধী অপরাধ করেন। সৈন্যরা গ্রামগুলিতে কিভাবে মর্টার ছুড়েছে, কিভাবে পলায়নপর গ্রামবাসীর উপর গুলি ছুড়েছে, কিভাবে তারা ঘরবাড়ি, শস্য এবং খাদ্য মজুদ ধ্বংস করেছে, কিভাবে বেসামরিক এলাকায় ল্যান্ডমাইন স্থাপন করেছে, কিভাবে বেসামরিক মানুষজনকে বিভিন্ন কাজ করতে জোর করে বাধ্য করেছে, আটক করেছে এবং নির্বিচারে হত্যা করেছে– সেসব বিষয় এই প্রতিবেদনে প্রমাণসহ তুলে আনা হয়।

হার্বার্ড ল স্কুল উল্লেখিত প্রতিবেদনে তিনজন সিনিয়র সেনা কর্মকর্তাকে যুদ্ধাপরাধের অপরাধে অভিযুক্ত করে, যাদের একজন পরে দেশটির স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হন। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, "সামরিক বাহিনী দ্বারা পরিচালিত অত্যাচার অত্যন্ত ব্যাপক, খুব দৃঢ়, এবং এত নিষ্ঠুর যে উপেক্ষা করা যায় না।" এতে আরও বলা হয় যে, উল্লেখিত তিনজনের বিরুদ্ধে যুদ্ধাপরাধ ও মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগে হেগের আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতে বিচার প্রক্রিয়া শুরু করা এবং তাদের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরেয়ানা জারি করার মতো যথেষ্ট প্রমাণ রয়েছে। কিন্তু এই তিনজনের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থাই নেওয়া হয়নি।

এর পরের বছর ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের ল স্কুল একটি আইনী বিশ্লেষণ ধর্মী প্রতিবেদনে রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে মায়ানমারের সামরিক বাহিনী পরিচালিত নিপীড়নের তথ্য প্রমাণ নথিবদ্ধ করে। রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে পরিচালিত নিপীড়ন ২০১২ সাল থেকে তীব্র আকারে বেড়েছে বলে এতে উল্লেখ করা হয়। প্রতিবেদনটি এই বলে উপসংহারে পৌঁছেছে যে, প্রাপ্ত প্রমাণগুলি বেশ দৃঢ়তার সঙ্গেই প্রমাণ করে যে, রাখাইন রাজ্যে গণহত্যার সব উপাদান উপস্থিত ছিল। এই প্রতিবেদনেও রাখাইন রাজ্যে মানবাধিকার পরিস্থিতি তদন্তের একটি কমিশন প্রতিষ্ঠায় সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য জাতিসংঘের প্রতি আহ্বান জানিয়েছিল। এতে বলা হয়, "মিয়ানমারকে তার সীমানায় সংঘটিত হওয়া গণহত্যা প্রতরোধে ব্যর্থ হওয়ার জন্য 'গণহত্যার অপরাধ রোধ ও শাস্তি সংক্রান্ত সনদ (Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide) ' অনুযায়ী দায়ী করা যেতে পারে"। এক্ষেত্রেও অপরাধীদের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থাই নেওয়া হয়নি এবং আগের মতোই মায়ানমার কর্তৃপক্ষ সব অভিযোগ অস্বীকার করেছে।

বিশ্ব অপেক্ষা করেছে এবং এবং নিস্ক্রিয়তা বেদনাদায়ক পরিণতির কারণ হয়েছে। পরিস্থিতি খারাপতর হয়েছে । কাচিন ও শান রাজ্যের জনগণের চেয়েও রোহিঙ্গাদের অনেক বেশি ভুগতে হয়েছে।

আগের মতোই জাতিসংঘের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উদ্বেগ প্রকাশ করেন। অক্টোবরে ২০১৬–তে মিয়ানমারের রোহিঙ্গাদের উপর সামরিক অভিযানের পর, মিয়ানমারের মানবাধিকার বিষয়ক জাতিসংঘের বিশেষ সহকারী এই বছরের মার্চ মাসে বলেছিলেন যে, রাখাইন রাজ্যের অবস্থা ছিল ভবনার চেয়েও আশংকাজনক। গত মার্চ মাসে বিবিসিকে ইয়াংগি লি বলেছিলেন, "আমি এটাকে মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ বলবো। এটাকে নিশ্চিতভাবেই মিয়ানমারের সামরিক বাহিনী, সীমান্ত রক্ষী বাহিনী বা পুলিশ বা নিরাপত্তা বাহিনীর দ্বারা মানবতার বিরুদ্ধে সংগঠিত অপরাধ বলা যায়।

সহিংসতায় মিয়ানমারের অন্তত ৮৭ হাজার রোহিঙ্গা পালিয়ে যায়। মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে দৃঢ় অবস্থান নেওয়ায় মায়ানমার সরকার লিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে।

কয়েক মাস পরে, হত্যা, ধর্ষণ ও রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে মায়ানমার নিরাপত্তা বাহিনীর নির্যাতনের অভিযোগের তদন্তকারী জাতিসংঘ তদন্ত দলকে মায়ানমান কর্তৃপক্ষ সে দেশে ঢুকতে দিতে অস্বীকার করে।

বিশ্বের দৃষ্টি এক পাশে সরিয়ে রেখে মায়ানমার সামরিক বাহিনী তার নৃশংসতা অব্যাহত রাখে। গত আগস্ট থেকে রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে মিয়ানমারের সামরিক বাহিনীর পরিচালিত নিপীড়নকে ইতিমধ্যে জাতিসংঘ ও এর অঙ্গ সংস্থাগুলি "জাতিগত শুদ্ধি অভিযানের সুস্পষ্ট উদাহরণ' ("text book example of ethnic cleansing") এবং গণহত্যা ও মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ হিসেবে অভিহিত করেছে। তারপর থেকে প্রায় ৮ লাখ রোহিঙ্গা বাংলাদেশে পালিয়ে এসেছে গেছে।

ডক্টর উইথ আউট বোর্ডারস নামের একটি সংস্থার হিসাব অনুযায়ী, সামরিক অভিযানের প্রথম মাসেই কমপক্ষে ৬,৭০০ রোহিঙ্গা নিহত হয়। মানবাধিকার কর্মীরা রোহিঙ্গা গ্রামে রোহিঙ্গাদের পুড়িয়ে ফেলা, নারী নির্যাতন এবং রোহিঙ্গাদের নৃশংস হত্যার তথ্য প্রমাণ উপস্থাপন করেছে।

ন্যায়বিচারের দাবি এখন আরও সোচ্চার

গত সেপ্টেম্বরে মালয়েশিয়ায় একটি আন্তর্জাতিক গণ আদালত মিয়ানমারকে রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে পরিচালিত "গণহত্যার" জন্য দোষী সাব্যস্ত করেছে, এবং আদালত অভিমত প্রকাশ করে যে, বেসামরিক নাগরিকদের উপর পদ্ধতিগতভাবে পরিচালিত নিপীড়ন এবং অন্যান্য কার্যক্রমের কারণে মিয়ানমারের সেনাবাহিনীকে "যুদ্ধাপরাধী" হিসেবে অভিহিত করা যায়।

মিয়ানমারের রোহিঙ্গা, কাচিন এবং অন্যান্য জাতিগত সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে নিপীড়ন ও রাষ্ট্রীয় অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের ওপর পরিচালিত স্থায়ী গণ আদালতের সাত সদস্যের বেঞ্চ বলেন, মিয়ানমার সেনাবাহিনী "সরকারী দায়িত্ব"-এর অংশ হিসেবেই এসব অপরাধ সংঘটিত করছে। রায়ে বলা হয়, "উপস্থাপিত স্বাক্ষ্য প্রমাণের উপর ভিত্তি করে, এই ট্রাইব্যুনাল এই ঐক্যমত্যে পৌঁছেছেন যে, মায়ানমার কর্তৃপক্ষ কাচিন জনগণ ও অন্যান্য মুসলিম গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে গণহত্যা চালানোর প্রয়াস পেয়েছে।

গত ৩ নভেম্বর, নিউইয়র্কভিত্তিক হিউম্যান রাইটস ওয়াচ রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে জবরদস্তিমূলক ব্যাপক অত্যাচারের তদন্তে ব্যর্থতার কারণে দেশটিকে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতে নেওয়ার জন্য জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের কাছে আহ্বান জানায়। ইউরোপীয়ান পার্লামেন্ট সম্প্রতি মিয়ানমারের সহিংসতার সংশ্লিষ্ট অপরাধীদের বিরুদ্ধে "মানবাধিকার লঙ্ঘনের" দায়ে শাস্তিমূলক নিষেধাজ্ঞা আরোপের জন্য সদস্য রাষ্ট্রগুলোর প্রতি আহ্বান জানিয়েছে।

জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক হাই কমিশনার জাইদ রায়দ আল-হুসাইন বলেন, মিয়ানমারের রোহিঙ্গা মুসলমানদের বিরুদ্ধে গণহত্যার ঘটনা সংঘটিত হয়েছে এমন রায় কোন একদিন কোন আদালত দিলে তিনি মোটেও অবাক হবেন না। বিবিসির সাথে সাম্প্রতিক একটি সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, রোহিঙ্গাদের উপর হামলা "সুচিন্তিত এবং এবং সুপরিকল্পিত" ছিল এবং তিনি মায়ানমারের নেতা অং সান সু চিকে সামরিক কর্মকাণ্ড বন্ধ করার জন্য অধিকতর তৎপর হতে বলেছিলেন। জাইদ রোহিঙ্গাদের উপর পরিচালিত এই নিপীড়নকে "জাতিগত শুদ্ধি অভিযানের একটি সুস্পষ্ট উদাহরণ" হিসেবে উল্লেখ করেন।

গত মাসে তার সফরকালে, জাতিসংঘ মহাসচিবের বিশেষ প্রতিনিধি প্রমিলা প্যাটেন, দোষী সৈন্যদেরকে হেগ-এর আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের কাঠগড়ায় হাজির করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন।

রুয়ান্ডা, বসনিয়া ও দারফুরে গণহত্যার ক্ষেত্রে জাতিসংঘ যে ভূমিকা রেখেছিল, এক্ষেত্রেও যদি জাতিসংঘ সেই ভূমিকা পালন করতে পারে, তবে ভাল কিছু হওয়ার আশা করাই যায়।

জাতিসংঘের ট্র্যাক রেকর্ড.

১৯৯৪ সালে রুয়ান্ডা গণহত্যা প্রতিরোধে দুঃখজনক ব্যর্থতার পর, জাতিসংঘের দুই সাবেক প্রধান এবং কয়েকজন বিশ্ব নেতা রুয়ান্ডানদের কাছে ক্ষমা চেয়েছিলেন। ঐ গণহত্যায় সংখ্যাগরিষ্ট হুতুরা ৮০০,০০০ এরও বেশি তুতসী লোককে হত্যা করে।

১৯৯৮ সালে রুয়ান্ডার তৎকালীন প্রধানমন্ত্রীসহ গণহত্যার অপরাধীদের বিচারের সম্মুখীন হওয়ার সময় জাতিসংঘ গণহত্যার বিরুদ্ধে তার অবস্থান বেগবান করার একটি সুযোগ পায়। ১৯৯৮ সালের সেপ্টেম্বরের শুরুর দিকে একজন রাজনীতিবিদের বিরুদ্ধে প্রথম রায়টি প্রদান করা হয়েছিল। রুয়ান্ডা গণহত্যার অপরাধীদের বিচারের বিষয়ে একটি আলোচনায় জাতিসংঘ অক্টোবর ১৯৯৮ সালে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত ট্রাইব্যুনাল আন্তর্জাতিক অপরাধ বিচারে একটি নতুন যুগের সূচনা করেছে বলে উল্লেখ করেছিল।

যথাযথভাবে ভূমিকা পালনের ক্ষেত্রে জাতিসংঘের আরও একটি ব্যর্থতা দেখা যায় বসনিয়াতে। ১৯৯৫ সালের জুলাইতে স্রেব্রানিকায় ৮০০০ এরও বেশি বসনিয়ান মুসলমানদের হত্যা করা হয়েছিল। ১৯৯৯ সালে জাতিসংঘের তৎকালীন মহাসচিব কোফি আনান সাধারণ সভায় উপস্থাপিত এক প্রতিবেদনে উল্লেখ করেছিলেন, "স্রেব্রেনিয়ার দুঃখজনক ঘটনাটি আমাদের ইতিহাসকে চিরদিন তাড়িয়ে বেড়াবে ”। তবে,গণহত্যার দায়ে দোষী সাব্যস্ত করে বসনিয়ার কসাই নামে কুখ্যাত সাবেক বসনিয়ান সামরিক কমান্ডার রাটকো মালডিচকে জাতিসংঘের ফৌজদারী ট্রাইবুনাল কর্তৃক যাবজ্জীবন কারাদণ্ড প্রদান জঘন্য অপরাধের বিরুদ্ধে জাতিসংঘের অবস্থানকে জোরদার করে।

রুয়ান্ডা গণহত্যার ১০ বছরেরও কম সময় পর, পশ্চিম সুদানের দারফুরে সংগঠিত গণহত্যা আবারও বেসামরিক মানুষজনদের রক্ষায় জাতিসংঘ ও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের ব্যর্থতাকে সামনে নিয়ে আসে। ২০০৫ সালে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ একটি প্রস্তাবের মাধ্যমে দারফুরে সংঘটিত গুরুতর অপরাধের তদন্ত ও বিচারের জন্য দারফরুকে আন্তর্জাতিক ফৌজদারী আদালতের মুখোমুখি করে। ২০১০ সালে, আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত সুদানের প্রেসিডেন্ট ওমর আল-বশিরকে দারফুরে গণহত্যার অন্তত তিনটি ঘটনার জন্য অভিযুক্ত করেছিল।

বিদ্যমান কতিপয় বাঁধা

মায়ানমার আন্তর্জাতিক আইন আদালত প্রতিষ্ঠাকারী রোম সনদের স্বাক্ষরকারী দেশ নয়। অতএব, মিয়ানমারের পরিস্থিতি জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদকে সিদ্ধান্ত বা রেজুলিউশনের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতকে জানাতে হবে। এই সিদ্ধান্ত বা রেজুলেশনের আলোকেই আন্তর্জাতিক আদালত মানবাধিকার লঙ্ঘনের তদন্ত করতে পারবে এবং এবং নির্যাতনকারীদের বিরুদ্ধে মামলা করবে। তবে চীনের বিরোধিতার কারণে নিরাপত্তা পরিষদে এই ধরনের সিদ্ধান্ত নেওয়া প্রায় অসম্ভব। কয়েক দশক ধরে মায়ানমারের সঙ্গে চীনের রয়েছে শক্তিশালী অর্থনৈতিক ও ব্যবসায়িক সম্পর্ক। ২০০৭ সাল থেকে, রাশিয়ার সমর্থন নিয়ে চীন নিরাপত্তা পরিষদে ভেটো ক্ষমতা প্রয়োগ করে মায়ানমারের বিরুদ্ধে নেওয়া বেশ কয়েকটি প্রস্তাব আটকে দিয়েছে। দশকের পর দশক ধরে চীনের সমর্থন মায়ানমারের সামরিক জেনারেলদের আইনের উর্ধ্বে থকতে সহায়তা করেছে। এই দায়মুক্তি তাদের গণহত্যা চালানোর লাইসেন্স দিয়েছে।

চীনের সামনে সময় এসেছে তার কৌশল পুনর্বিবেচনা করার জন্য, যাতে ভবিষ্যতে দেশটিকে মায়ানমারের গণহত্যার অংশীদার হিসেবে অভিহিত হতে না হয়। দি চীন আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আদালতে মায়ানমারকে বিচারের সম্মুখীন করার জন্য জাতিসংঘের পদক্ষেপকে সমর্থন করে, তবে দোষীদের বিচারের জন্য প্রমাণের কোনও অভাব থাকবে না।